ভূমিকা

ভূমিকা

রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি তাঁর গর্ভে বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির জন্ম দিয়েছেন, যাঁরা নিজেদের কর্মজীবনের দ্বারা বাংলাদেশ তো বটেই ভারতবর্ষ তথা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে নিজেদের নাম মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই রকমই একজন বাঙালি কর্মযোগী হলেন স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ – ১৯০২)। কলকাতার শিমুলিয়া (সিমলা) পল্লীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মানো এই যুগপুরুষটি জীবকল্যাণেই নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। হিন্দুধর্মের প্রচারক হিসেবে অনেকে তাঁকে অভিহিত করতে চাইলেও তিনি নিজের পরিচয় শুধু ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। তিনি একাধারে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মানুষকে আলো দেখাতে যেমন উদ্যোগী হয়েছিলেন, তেমনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজকে এগিয়ে এসে এক নতুন দেশ, জাতি তথা বিশ্ব গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে শুধু আহ্বান জানিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, নিজের সমগ্র জীবনকেও এই মহান কর্মে নিয়োজিত করে গেছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই কর্মযোগী। নিজের কর্মগুণেই আজ তিনি বাংলা তথা ভারতের যুব সমাজের আইকন। এই বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিটি যেমন মানব সমাজকে আলো দেখানোর জন্য নানা মহান কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তেমনি নিজের বক্তব্য, আদর্শ, চিন্তাভাবনাকে মানবসমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলমও ধরেছিলেন। এজন্য তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, গুরুভাই সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পত্র প্রেরণ করেছিলেন, নানা স্থানে প্রচুর বক্তব্য রেখেছিলেন (যেগুলি পরে মুদ্রিত হয়েছে), কিছু ভিন্ন ভাষার রচনা অনুবাদ করেছেন এবং অল্প সংখ্যক কবিতা ও সঙ্গীত

রচনা করেছেন। এগুলিকেই বিবেকানন্দের সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বিবেকানন্দ ছিলেন বাংলা মাতার উনিশ শতকের সন্তান। এই উনিশ শতক বিভিন্ন কারণে বাঙালি জীবনে অনিবার্য ছাপ রেখেছে। এইসময় ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার কারণে বাঙালির জীবন ও আচার-আচরণে যেমন নানা পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করে, তেমনি বাঙালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তাধারাতেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই অনেকেই উনিশ শতককে বাঙালির নবজাগরণের শতক বলে অভিহিত করেন। এই শতকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে পদ্যের পাশাপাশি গদ্যভাষাও নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করে নেয়। আগেই বলা হয়েছে বিবেকানন্দ ছিলেনে মূলত ধর্মসংস্কারক তথা সমাজসংস্কারক। তিনি এই উদ্দেশ্যেই কলম ধরে গদ্যচর্চা করে গেছেন জন্য তাঁর হাত ধরে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই বিবেকানন্দের জীবন ও সাহিত্যকর্মের আলোচনায় অবধারিতভাবে উনিশ শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার আলোচনার পাশাপাশি বাংলা গদ্যের বিকাশের রূপরেখাটির দিকে আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে বাংলাদেশের বহু বিশ্ববন্দিত মনীষী ও সাহিত্যিকেরও আবির্ভাব ঘটেছে। মধ্যযুগীয় দৈব নির্ভরতা কাটিয়ে এই শতকের বাঙালি অনেকটাই যুক্তি নির্ভর হয়ে ওঠে। এই শতকে বাংলার সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যও নতুন পথে বাঁক নেয়। ফলে অনেক নতুন সাহিত্য প্রকরণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পাশাপাশি নানা সমাজ সংস্কারমূলক কার্যাবলীও শুরু হয়। সংস্কারকদের হাত ধরে একে

একে উঠে আসে সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, জাতিভেদ, সহবাস সংক্রান্ত সমস্যার মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি। ধর্মের ক্ষেত্রেও নানা সংস্কার ও রূপান্তর লক্ষ করা যায়। তখন এদেশের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন ইংরেজরা। এই শতকের গোড়াতে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। এখানেই প্রথম ছাপাখানা বসানো হয়, যেখান থেকে বাংলা হরফে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ শুরু হয়; অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদও এখানে হয়েছে। এদিকে লর্ড ওয়েলেসলি ইংল্যান্ড থেকে এদেশে আগত ইংরেজ সিভিলিয়নদের এদেশীয় ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ থেকে প্রথম বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়। এখানে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, উইলিয়াম কেরির মত ব্যক্তিত্বরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ কয়েকটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। আবার ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দিক্‌দর্শন পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলা সাময়িক পত্রের যাত্রা শুরু হয়। এগুলি সবই ছিল খ্রিস্টান ইংরেজদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এদের লেখা দ্বারা প্রায়শই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা হত। তাই হিন্দুরাও এগুলির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছিল। এসময় হিন্দুদের মধ্যেও দু'টি গোষ্ঠী মাথাচাড়া দেয় – রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল। নানা বিষয় নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের সংঘাত দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে এই শতকের সূচনায় উল্লেখযোগ্য বাঙালি ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা রামমোহন রায়কে পাই। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মূলত ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কারই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সহমরণপ্রথা রোধে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর অক্লান্ত

প্রচেষ্টায় এবং লর্ড উইলিয়ম বেন্টিকের উদ্যোগে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহপ্রথা রদ সংক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হয়। তিনি ধর্মীয় কুসংস্কারমুক্ত এক সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। এইজন্য তিনি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি 'ব্রাহ্মধর্ম' নামে এক নতুন ধর্মমতেরও প্রবর্তন করেন। নিজের ধর্মীয় মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে 'আত্মীয়সভা' ও ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রাহ্মসভা' স্থাপন করেন। এসব বিষয়ে নিজের বক্তব্য জানানোর জন্যই তিনি কলম ধরেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে যুক্তি প্রমাণসহ নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ফলে সদ্য জন্মা বাংলা গদ্য যুক্তিনির্ভর হতে শুরু করে। অনেকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মুন্সীদের অবদানকে স্মরণ রেখেও রামমোহনকে বাংলা গদ্যের জনকত্বের স্বীকৃতি দিতে চান। তবে রামমোহনের প্রবল প্রচেষ্টা বাংলার সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা যায়নি। সামাজিক কুসংস্কারগুলির কবলে পরে অকালে বহুপ্রাণ নষ্ট হয়েছে। এইসময়ে ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীও বাংলার সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসে। তখনকার সমাজে বিশেষ করে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর। কৌলীন্যপ্রথা নামক সামাজিক ব্যাধি নারীদের জীবনে ডেকে নিয়ে আসত অকাল বৈধব্যের অভিশাপ। বিদ্যাসাগর এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যেই বিধবাদের বিবাহ দিতে এগিয়ে আসেন। শুরু হয় বিধবাবিবাহ আন্দোলন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের পূর্বে কালীকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিধবাবিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলার সমাজে একটা পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়, যা পঞ্চাশের দশকে

গিয়ে একটা ভিন্ন মাত্রা পায়। এই পঞ্চাশের দশক সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে জানান—

> "১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তি সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল।"[১]

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বিধবাবিবাহের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। বিধবাদের জন্য তিনি লিখেছেন দুটি খণ্ডে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫)। তিনি বলেছেন—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রমুখ অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্যনির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যাপাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে।[২]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। কৌলীন্য রক্ষার জন্য বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহকে বিদ্যাসাগর সমর্থন করেননি। বহুবিবাহের বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে লিখেছেন 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (দুটি খণ্ডে- ১৮৭১, ১৮৭৩)। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অপরিসীম।

সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির জন্য তো তিনি কলম ধরেছিলেনই; এছাড়াও তিনি নানা ধরনের গদ্যগ্রন্থ রচনা করে এবং বাংলা গদ্যে বিরামচিহ্নের ব্যবহার চালু করে তাকে যথার্থ সাহিত্যের ভাষা গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিই হলেন বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী।

এদিকে রামমোহন যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ব্রাহ্মসভা (১৮২৮) স্থাপন করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাকে এগিয়ে নিয়ে যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা ভাবপ্রচার ও জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক রচনা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও সমকালীন বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি বাংলা গদ্যের চর্চা করেছেন। এমতাবস্থায় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাঁকে অনুসরণ করে আরও অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম মতামত প্রচারের পাশাপাশি সমাজসংস্কারেও হাত লাগিয়েছেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে বলেছেন—

> "১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। 'ভারতসংস্কার' সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে পাঁচপ্রকার কার্য্যের আয়োজন করিলেন : (১ম) সুলভ সাহিত্য, (২য়) সুরাপান নিবারণ, (৩য়) শ্রমজীবী-বিদ্যালয়, (৪র্থ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ।"[৩]

যাইহোক, এসব কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলার সমাজে নারীদের অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে। শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে আসতে থাকেন। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্র, সাহিত্যচর্চা, দেশসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। 'মাসিক', 'বামাবোধিনী', 'অবলাবান্ধব' প্রভৃতি পত্রিকা এক্ষেত্রে অণুঘটকের কাজ করেছে। অধ্যাপক স্বপন বসু জানিয়েছেন—

> "বাঙালিসমাজে ব্রাহ্ম মেয়েরাই অন্তঃপুরের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রকাশ্য জনজীবনে যুক্ত হওয়ার সাহস দেখান। ফলে সমাজে তাঁদের একটা পরিচিতি গড়ে ওঠে। অব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যেও যাঁরা জনসমাজে পরিচিতি অর্জন করেন, তাঁদের প্রয়াণ-সংবাদও যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পরিবেশিত হত। মহারানি স্বর্ণময়ী, মহারানি শরৎসুন্দরী কিংবা কবি তরু দত্তের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশে উনিশ শতকের অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা এগিয়ে আসে। সবমিলিয়ে সমাজে নারীর মূল্য খুব সামান্যভাবে হলেও যে স্বীকৃত হচ্ছে—নারীর জীবনীগ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের ক্রমবর্ধমান প্রয়াণ-সংবাদ তারই পরোক্ষ প্রমাণ।"[৪]

কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্য বৃদ্ধি পায়। তবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'আদিব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ করেন। তিনি অনুগামীদের নিয়ে গঠন করেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। তবে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে মতভেদ চরমে উঠলে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ তাঁর সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। অধ্যাপক স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন—

"কেশবপন্থীদের কিছু কিছু আচরণ ব্রাহ্মদেরই একাংশ মেনে নিতে পারলেন না, নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে বিভেদ যখন দানা বাঁধছে, সেই সময়েই ব্রাহ্মরা হিন্দু অথবা হিন্দু নয়—এই প্রশ্ন সামনে এসে পড়ে। বিবাহ সম্পর্কে নতুন একটি বিধি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের মতভেদ চরমে ওঠে। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরীণ এই দুর্বলতার সময়ে হিন্দুত্বে আস্থাবান মানুষজন ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পান। হিন্দু ধর্মই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই কথা সদর্পে উচ্চারিত হতে থাকে।"[৫]

এদিকে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী মানুষজন ব্রাহ্মদের কার্যকলাপকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করতে পারলেন না। রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নিয়ে বক্তৃতা দেন। এই সময়ের অন্যতম প্রাণপুরুষ হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব ঘটে। ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেন সহ আরও অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব কমতে থাকে। এইসময়য় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা হলেন কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ। এমনই এক পটভূমিকায় বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটে। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী' গ্রন্থে স্বামীজীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বলছেন—

"স্বামী বিবেকানন্দ যখন কলিকাতার এক গলির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন প্রায় ৩০ বৎসর অতীত হইল রামমোহন ব্রিষ্টলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে পঞ্চদশ বৎসর পরিচালিত করিয়া, কেশবচন্দ্রের হস্তে শতাব্দীর এই অভিনব ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনকে পৌঁছাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছেন, কেননা

আর মাত্র তিন বৎসর পরেই কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথের সহিত জাতিভেদের সমস্যা লইয়া কলহ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার একমাত্র নেতা হইয়া ইহাকে বিভিন্ন পথে পরিচালিত করিবেন। রামমোহন মূর্তিপূজা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন,—দেবেন্দ্রনাথ বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের স্থানে আত্মপ্রত্যয়কে ঈশ্বর-উপলব্ধি ও ধর্ম-সাধনার ভিত্তি করিয়াছেন,—রামমোহনের শঙ্করানুবর্তী অদ্বৈতবাদ পরিহার করিয়া, এক নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তন করিয়াছেন,—কেশবচন্দ্রের খৃষ্টবিভীষিকা দেখিতেছেন। মহাপুরুষবাদের পূর্বাভাষ প্রকট হইয়াছে;—বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে ছয় বৎসর হইল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ঘোরতর প্রতিবাদ সত্ত্বেও হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়াছেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণ তখনও সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন,—ডিরোজীওর শিষ্যদের দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি সেই যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা, সমাজ-বিদ্রোহ, নাস্তিক্যবাদ একেবারে তিরোহিত হয় নাই,—ইতস্তত তাহার স্ফুলিঙ্গ দেখা যাইতেছে একেবারে নির্বাপিত হয় নাই। অন্যদিকে স্যার রাধাকান্তের ধর্মসভা রূপান্তরিত হইয়া, বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে হরিসভারূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নবগোপাল মিত্রের জাতীয়মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ এই বিচিত্র বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য একটা প্রাণপণ চেষ্টার পরিচয় দিতছে। কলিকাতায় শিক্ষিত সমাজে যখন এইরূপ সংস্কার ও সংরক্ষণের বহুবিধ তরঙ্গ যুগপৎ উত্থিত হইয়া সমাজচিত্তকে আলোড়িত ও বিক্ষোভিত করিতেছে, তখন একদিন—১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হইলেন।”[৬]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নরেন্দ্রনাথের। তাঁর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে। নির্বিকল্প সমাধির আশা ত্যাগ করে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ত্যাগ, কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে ভারত পরিক্রমা করেন। নরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ। সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে চিকাগো মহাধর্মসভায় যোগদান করেন এবং ভারতবর্ষের কথা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। অধ্যাপক স্বপন বসু তাঁর 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' গ্রন্থে স্বামীজী সম্পর্কে লিখেছেন—

> "সনাতন ধর্ম ও ঋষিবাক্যে অগাধ আস্থা থাকলেও, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে স্বামীজি উদাসীন ছিলেন না। জনগণের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবন, মানুষে-মানুষে বিভেদ, উচ্চবর্ণের সীমাহীন অত্যাচার, ভারতের দুরবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন। নিম্নবর্ণের মানুষকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার কথা বারবার তিনি বলতে থাকেন। অগতানুগতিক পথে সনাতন ধর্ম প্রচারের এই ধারাটির প্রতি হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ আকৃষ্ট হন। উদার মনোভাব, দুঃখী মানুষের জন্য দরদ ও সনাতন আদর্শে অবিচল আস্থা নিয়ে স্বামীজি হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করতে চাইলেন।"[৭]

বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' ও 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'কে শিরোধার্য করে বহুজনহিতায় নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। তবে তাঁর পরিচয় শুধুমাত্র ধর্মপ্রবর্তক বা সন্ন্যাসী নয়। তিনি কলকাতার কথ্যভাষাকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে চলিতভাষা বিবর্তনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। সাহিত্যিক হিসাবেও বিবেকানন্দ স্বতন্ত্র স্থানের অধিকারী। তাঁর বাংলা মৌলিক রচনার সংখ্যা কম—চারটি প্রবন্ধগ্রন্থ, ১৫৩টি চিঠি এবং কিছু বাংলা কবিতা। এছাড়াও তিনি বেশ কিছু গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন এবং সঙ্গীত

রচনা করেছেন। আমাদের গবেষণায় সেগুলির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হবে।

এই গবেষণা বিষয়টিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যেহেতু বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী না জানলে কোনও কথাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রথম অধ্যায়ে বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবেকানন্দের বাংলা সাহিত্যের পরিচয় ও শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবেকানন্দের রচিত বাংলা সাহিত্যকর্মের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান ও প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১৪৮।

২। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পাদনা সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়, পঞ্চম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৪২১, পৃ. ৫৭৮।

৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২০০।

৪। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, স্বপন বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৩, পৃ. ৭৭।

৫। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপণি, পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৩৪০।

৬। স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, সম্পাদনা : রঞ্জিত সেন, অরুণা প্রকাশন, ২ কালিদাস সিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২৩২-২৩৩।

৭। বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ. ৩৪৭।